ইউনিট ৫:   শিক্ষা মনোবিজ্ঞান

ভূমিকা

মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের সাধারণের ধারণা খুবই অপ্রতুল। বিজ্ঞানের নাম শুনলেই আমাদের অনেকের মনে হয়, না জানি কি ভীষণ জটিল বিষয়। পারতপক্ষে বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের মধ্যে একধরনের ভীতি কাজ করে বলে এরূপ ধারণা জন্মে। তার উপর বিষয়টি যদি হয় মনোবিজ্ঞান। তাহলে তো কথাই নেই। বিষয়টি খুবই জটিল ও রহস্যাবৃত হবে বলে পূর্ব থেকেই ধারণা করে নিই। আসলে মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের সীমাবদ্ধ ধারণা থাকার কারণে এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অনেকে ধারণা করে থাকেন, মনোবিজ্ঞানের পাঠ করলে বোধ হয় মানুষের মনের কথা বলে দেয়া যায় সহজে। কিংবা মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে অন্যকে সহজে বশীকরণ করা যায়। আসলে এসব খুবই প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা। মনোবিজ্ঞান (Psychology) শব্দটির উল্লেখ আমরা দেখতে পাই খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর দিকের সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রে। মনোবিজ্ঞান শব্দটি গ্রীক শব্দ Psyche (মন বা আত্মা) এবং Logos (বিজ্ঞান) হতে এসেছে। শাব্দিক অর্থের দিক হতে এটি সহজেই অনুমেয় যে, মনোবিজ্ঞান মন সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। কিন্তু মন বা আত্মা ব্যাপক ও জটিল বিষয়। এ সম্পর্কে মানুষের ধারণা খুবই সীমাবদ্ধ। বরং কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ আচরণের মাধ্যমে যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে তা সহজেই পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা করা যায়। এভাবে মনোবিজ্ঞান ক্রমশঃ আচরণ মনোবিজ্ঞানের রূপ লাভ করেছে। বাহ্যিক আচরণ ছাড়াও ঘটনার পর্যবেক্ষণ, পঠন ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নানা বিষয়ে আমাদের ধারণা ও মনোভাবের পরিবর্তন হয়। সুতরাং আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে মনোবিজ্ঞান হলো আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনা (ক্রাইডার ও অন্যান্য, ১৯৮৩)।

মনোবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শিশুর বিকাশ, শিশুর শিখনে শিশুর বর্ধন ও বিকাশের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিশুর শিখনের প্রথম ধাপ পরিবারের মাধ্যমে পেয়ে থাকে। আস্তে আস্তে শিশু তার চেনা গণ্ডি ছেড়ে বাহিরের জগতে মেলামেশা করতে শেখে। বাবা-মা, ভাই-বোনের পর শিশু তার খেলার সাথীদের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করে। খেলার সাথী ও প্রতিবেশীদের গণ্ডি পেরিয়ে এক সময় তার চেনা-জানার পরিসর আরো বিস্তৃত হয় বিদ্যালয়ে প্রবেশের মাধ্যমে। এখানে সে পায় তারই সমবয়সী, সহপাঠী ও শিক্ষক। এভাবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিশুর জীবনে নান ধরনের উপাদানের সমাবেশ ঘটে যা শিশুর শিখনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। শিক্ষার্থীবৃন্দ শিক্ষা মনোবিজ্ঞান কী? শিশুর বিকাশে সামাজিক পটভূমি এবং শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে গবেষণা কেন প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়গুলো ইউনিট- ৫-এর আলোচ্য বিষয় যা তিনটি পাঠের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

পাঠ ৫.১	:	শিক্ষা মনোবিজ্ঞান কী?
পাঠ ৫.২	:	গবেষণায় শিক্ষা মনোবিজ্ঞান
পাঠ ৫.৩	:	বিকাশে সামাজিক পটভূমি: পরিবার, সহপাঠী ও বিদ্যালয়

পাঠ- ৫.১: শিক্ষা মনোবিজ্ঞান কী?

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মনোবিজ্ঞানের শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মনোবিজ্ঞানের পরিধি বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সাথে মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু বিবৃত করতে পারবেন।

মনোবিজ্ঞানের পরিধি

মনোবিজ্ঞানের পরিধি খুবই ব্যাপক। এটি শিশুর দৈহিক, মানসিক, জ্ঞানীয় ও সামাজিক বিকাশ হতে শুরু করে শিল্প-বাণিজ্যে কর্মী নির্বাচন, প্রেষণা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা মূল্যায়ন এমনকি সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অপরাধী সনাক্তকরণ ও নির্দেশনা প্রদান পর্যন্ত ব্যাপৃত। শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য শিশুর বয়স ও আগ্রহের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবিষয়, শিখন প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমান সময়ে প্রতিবন্ধীতা (Handicapped), শারীরিক বিকলতা (Impaired), অক্ষমতা (Disabled) তথা ব্যতিক্রমধর্মী বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মানসিক বিকাশেও অভূতপূর্ব অবদান রাখছে। এছাড়াও মনোবিজ্ঞান জ্ঞানের অন্যান্য শাখা যেমন: Neuroscience বা স্নায়ুবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান (Sociology), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science), অর্থনীতি (Economics) ইত্যাদি বিষয়ের গবেষণায় অবদান রাখছে। রোগের সাথে ব্যক্তির আচরণের সম্পর্ক ও প্রতিরোধের জন্য স্বাস্থ্য মনোবিজ্ঞান (Health Psychology), খেলোয়াড়দের মনোবল ও প্রেষণা বৃদ্ধির জন্য ক্রীড়া মনোবিজ্ঞান (Sports Psychology) বর্তমান সময়ে নতুন অবদান। অপরাধ মনোবিজ্ঞান (Criminal Psychology) অপরাধীর ইচ্ছা, চিন্তা ভাবনা, অভিপ্রায় ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পেতে সহায়তা করে।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান

শিক্ষার কার্যকরী সংজ্ঞায় দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষা হল অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে আচরণের ও মানসিক প্রক্রিয়ার অপেক্ষাকৃত কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। শিক্ষার কার্যকারিতা নির্ভর করে সফল শিখনের উপরে। অতএব শিখন প্রক্রিয়া হচ্ছে শিক্ষার একটি অপরিহার্য অংশ। কার্যকরী শিখনের জন্য শুধু শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া জানাই যথেষ্ট নয়। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ, শিখন ক্ষমতা যেমনি জানা প্রয়োজন তেমনি শিক্ষার্থীর শিখনের মূল্যায়ন কিংবা শ্রেণিকক্ষে প্রেষণা প্রদান, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা ও বিদ্যালয়ে উদ্ভূত নানা সমস্যা সম্পর্কে জানা ও উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান ইত্যাদি বিষয়াদি জানা থাকা প্রয়োজন। আর এসবই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সাথে মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান মূলত মনোবিজ্ঞানের একটি প্রায়োগিক শাখা। মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা হতে সংগৃহীত তত্ত্ব, তথ্য এবং পদ্ধতি শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিশু মনোবিজ্ঞান (Child Psychology) থেকে শিশুর শারীরিক, আবেগিক, জ্ঞানীয় ও সামাজিক বিকাশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া

যায়। উক্ত ধারণা শিশুর শিক্ষার পাঠ্যসূচি নির্ধারণ, পঠন-পাঠন পদ্ধতি ও মূল্যায়নে ব্যবহার করা হয়। বিমূর্ত বিষয়ের তুলনায় মূর্ত বিষয় শিশুর শিখনকে ফলপ্রসূ ও অনেক বেশি স্থায়ী করে যা শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হতে জানা যায়। তাই পাঠ্যসূচিতে ইতিহাসের ধারাবাহিক আলোচনায় ছয় দফা দাবী-র মতো বিমূর্ত ধারণার তুলনায় বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের জীবনী আগে স্থান পায়। কেননা শিশুদের কাছে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের জীবনী আলোচনা অনেক বেশি মূর্ত বিষয় বা বাস্তব উদাহরণ।

আবার বয়োঃসন্ধি মনোবিজ্ঞান (Adolescent Psychology) হতে বয়ো:সন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সেই অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তরের পঠন পাঠন কার্যক্রম এবং শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য, নির্দেশনা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। মনোবিজ্ঞানের পরিসংখ্যানগত তত্ত্ব এবং তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। শিক্ষা পরিমাপ ও মূলায়নে এসব মনোবৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যানগত ধারণা, শিক্ষার্থীর অর্জন পরিমাপ, তুলনা এবং অর্জনের সাথে অন্যান্য প্রভাবকের তুলনা করতে সহায়তা করে। শিখন ও শিক্ষার্থী বিষয়ক গবেষণায় অহরহই মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলো ব্যবহৃত হয়।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু

শিক্ষার চারটি মূল উপাদান হলো শিক্ষার্থীর বয়স ভিত্তিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ, সেই অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও শ্রেণিভিত্তিক বণ্টন, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া ও অর্জিত শিখনফলের মূল্যায়ন। শিক্ষা কার্যক্রম কার্যকরভাবে পবিচালনার জন্য উপরোক্ত চারটি উপাদান প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ব্যবহৃত হয়। প্রথমত যেকোন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার আগে আমরা এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করি। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর চাহিদা-আগ্রহ ও ক্ষমতা অনুযায়ী নির্ধারণ করতে সহায়তা করে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান। উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কোন বিষয়বস্তু অন্তর্ভূক্তকরণ ও তার উপস্থাপন শিক্ষার্থীর জন্য সবচেয়ে উপযোগী হবে তা চিহ্নিত করতে মনোবিজ্ঞানিক ধারণা সহায়তা করে। একই রকমভাবে নির্ধারিত বিষয়বস্তু কোন পদ্ধতিতে পাঠদান করলে বা উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ এবং কার্যকর শিখন নিশ্চিত হবে মনোবিজ্ঞান সেই সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। বয়স, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র এবং বিষয় ভিন্নতা অনুযায়ী অর্জিত শিখন শিক্ষার্থীদের আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে পেরেছে কিনা এবং এই পরিবর্তন স্থায়ী কিনা তা জানা যায় শিক্ষা মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপ পদ্ধতির সাহায্যে। সুতরাং শিক্ষা মনোবিজ্ঞান শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

শিশু বা শিক্ষার্থীই হলো শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের অধ্যয়নের বিষয়বস্তু। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান শিশুর সামগ্রিক বিকাশ তথা শিশুর মানসিক, প্রক্ষোভিক (Emotion), জ্ঞানীয় ও সামাজিক বিকাশ সাধন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। জন্মের পর থেকে ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষণ (Perception), স্মৃতি (Memory), চিন্তন (Thinking), কল্পনা (Imagination), ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুর মানসিক বিকাশ (Mental Development) সাধিত হতে থাকে। এসব মানসিক বিকাশই হলো বৌদ্ধিক বিকাশ (Intellectual Development) যা শিখন (Learning), পরিণমন (Maturation) এবং শিক্ষার উপর নির্ভর করে। শিশুর সামগ্রিক শিখন প্রক্রিয়া (Learning Process) তথা শিশু কিভাবে শেখে, শিখনের নিয়মাবলী (Laws of Learning), শিশুর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র, শিশুর আগ্রহ, আবেগ-প্রক্ষোভের (Emotion) সাথে শিখনের সম্পর্ক, শিখনকে স্থায়ী ও ত্বরান্বিত করার জন্য প্রেষণা (Motivation), নির্দেশনা (Guidance), শিখন মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের আওতাধীন।

শিখন: শিখন শিক্ষা মনোবিজ্ঞান পাঠের একটি বড় আলোচ্য বিষয়। অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে আচরণের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন-ই হলো শিখন। এটি একটি জটিল মানসিক প্রক্রিয়া। মনোবিজ্ঞানীরা মানব শিখনকে আচরণবাদ, জ্ঞানমূলক মতবাদ, গঠনবাদ, এমনকি জৈবিক ভিত্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন: আচরণবাদীরা শিখনকে মনে করেন সব রকমের শিখনের জন্য কতকগুলো শর্ত উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। শিখনের জন্য একটি

প্রয়োজনীয় শর্ত হলো সংযোগ (Association)। অর্থাৎ অতীতে সংগঠিত দু'টি ঘটনার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে শিখন সংগঠিত হয়। শিখনের আরেকটি পূর্বশর্ত হলো বলবৃদ্ধি (Reinforcement)। প্রধান প্রধান আচরণ মনোবিজ্ঞানীদেও মধ্যে রাশিয়ার শরীরবিদ প্যাভলভের (I P Pavlov) চিরায়ত সাপেক্ষণ (Classical conditioning), বি.এফ স্কিনারের (B.F Skinner) করন শিক্ষণ (Instrumental Learning) উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানমূলক মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন সংযোগ বা বলবৃদ্ধি নয় বরং বয়সের সাথে সাথে পরিণমনই মানব শিখনের জন্য দায়ী। জ্ঞানমূলক মনোবিজ্ঞানীদের পুরোধা জ্যঁা পিঁয়াজে মনে করেন, শিশুর ভিন্ন ভিন্ন বয়সের স্তরে ভিন্ন ভিন্ন শিখন সাধিত হয়। অন্যদিকে গাঠনিক মনোবিজ্ঞানীরা শিখনের জন্য সামাজিক মিথস্ক্রিয়াকে গুরুত্বপুর্ণ অংশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীরা শিখনকে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সহায়তায় জৈবিক ও স্নায়ুগত ভিত্তির জন্য ক্রমাগত গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রেষণা: কার্যকরী শিখনের জন্য শুধুমাত্র সুন্দর শিখন পদ্ধতিই যথেষ্ট নয়; শিশুকে শিখন গ্রহণের জন্য উপযুক্তভাবে উদ্দীপিত করাও একজন শিক্ষকের দায়িত্ব। বয়স, ব্যক্তিত্ব এবং শিশুর পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিন্নতায় শিশুর ভিন্ন ধরনের উদ্দীপনার দরকার হতে পারে। শিশুকে শিখনের জন্য উপযুক্ত উদ্দীপনা প্রদান করাই হলো শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের প্রেষণা (Motivation)। প্রেষণার উপর শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক গবেষণা রয়েছে। তার মধ্যে মাসলো (Maslow)-এর চাহিদা তত্ত্ব উল্লেখযোগ্য।

বুদ্ধিমত্তা ও ভিন্নতা: প্রকৃতির অন্যান্য অংশের মতোই মানব সন্তানও ভিন্নতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই ভিন্ন যেমন তার শারীরিক গঠনে ঠিক তেমনি তার মননেও। প্রতিটি শিশুই স্বতন্ত্র অর্থাৎ শিশুর ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, আবেগের ভিন্নতা রয়েছে। এই ভিন্নতা শিশুর শিখনে এবং বিকাশে ব্যাপক প্রভাব রাখে। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান বিভিন্ন অভীক্ষার মাধ্যমে শিশুর শিখনের মাত্রা, ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে তার জন্য উপযুক্ত শিখন প্রণালী প্রণয়নে সহায়তা করে। যেমন বুদ্ধিমত্তা অভীক্ষার মাধ্যমে তার জন্য বিশেষ শিক্ষার চাহিদা পূরণ করা হয়। অধূনা শিক্ষা মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যেমন হাওয়ার্ড গার্ডনার-এর বহুমুখী বুদ্ধিমত্তা মনে করে প্রতিটি শিশুই কোন নাকোন বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। শ্রেণি শিখনে এসব বুদ্ধিমত্তার ধারণাকে ব্যবহার করে প্রত্যেক শিশুর সুপ্ত বা লুক্কায়িত বুদ্ধিমত্তাকে উদ্দীপিত করা সম্ভব।

আবেগ: আবেগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া যা সরাসরি মানব আচরণকে প্রভাবিত করে। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীরা শিশুর আবেগকে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে শিশুর সর্বোচ্চ শিখন এবং মানসিক স্বস্থ্য সুনিশ্চিত করেন। রাগ, দুঃখ, হাসি, কান্না-এগুলো মানুষের প্রাথমিক আবেগ। গবেষণায় দেখা গেছে এসব আবেগ শিশুর শিখনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। শিশু কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ে তখনি ভাল ফলাফল করে যখন বিষয়টির সাথে ভালো লাগা জড়িত থাকে। শিশুকে তার বয়স অনুযায়ী আবেগের চাহিদা মোতাবেক পাঠদান করতে পারলে সর্বোচ্চ শিখন সম্ভব।

উপদেশনা ও নির্দেশনা: শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্যের ন্যায় মানসিক স্বাস্থ্যও শিশুর সামগ্রিক বিকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক কিংবা মাধ্যমিক যে শ্রেণিতে অধ্যয়নরত হোক না কেন শিশুকে বিদ্যালয়ে দিনের একটা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে হয়। পারিবারিক কিংবা সামাজিক নানা কারণে অথবা শিশুর বয়োঃসন্ধিকালীন আবেগিক পরিবর্তনের ফলে হতাশা, মানসিক দ্বন্দ্বসহ নানা ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন পরামর্শদাতা (Counselor) নিয়োজিত থাকলে তিনি শিশুকে তার সমস্যা কাটিয়ে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশনা ও নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন।

শিখন শেখানো ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনা: মনোবিজ্ঞানের শিখন তত্ত্বগুলো ব্যবহার করে শিক্ষক কিভাবে শিক্ষার্থীর সম্মুখে উদ্দিষ্ট পাঠ উপস্থাপন করবেন তা শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের একটি বড় অংশ। ছোটদের জন্য প্যাডাগোজি

(Pedagogy) এবং বয়স্কদের জন্য এন্ড্রাগোজি (Andragogy) নামে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান শিখন শেখানোর জন্য নানা পদ্ধতির উপর ক্রমাগত গবেষণা পরিচালনা করে। এসব গবেষণা বহুল প্রচলিত বক্তৃতা পদ্ধতির কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য যেমন নানা ধরনের পরিপূরক মাধ্যম (ছবি, ভিডিও ক্লিপিংস)-এর জন্য সুপারিশ করে ঠিক তেমনি অধুনা বহুমুখী বুদ্ধিমত্তা শিখন শেখানো পদ্ধতি অথবা ইন্টারএকটিভ বা ভার্চুয়াল ক্লাস রুমের মতো উদ্ভাবনী শিখন শেখানোর পদ্ধতিগুলোর কার্যকারিতা যাচাই করে থাকে।

পরিমাপন: পরিমাপ ও মূল্যায়ন শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিক্ষার্থীদের শিখনে কতটুকু অগ্রসর হলো সেটি তার বয়সদলের সাথে অথবা তার নিজের সাথে তুলনার জন্য উপযুক্ত অভীক্ষা তৈরি করে থাকে। একাডেমিক বিষয়ের সাথে সাথে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান শিক্ষার্থীর দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, প্রবণতা এবং কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে মনোভাব আছে কিনা– সেটিরও মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা তৈরি করে। এসব অভীক্ষার ফলাফলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দুর্বল দিক চিহ্নিতকরণ, সঠিকভাবে পাঠদান, বিষয় নির্বাচন অথবা দক্ষ বা উপযুক্ত শিক্ষক বা রিসোর্স পারসনের সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়।

শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। ক্রমাগত প্রযুক্তির ব্যবহার, শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা শিক্ষায় নবনব চ্যালেঞ্জ-এর সম্মুখীন করছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষা মনোবিজ্ঞানেও গবেষণা ও উদ্ভাবন অব্যাহত রয়েছে। এভাবেই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পরিধিও আরো বিস্তৃত হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. Psychology শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ক. গ্রীক
খ. ল্যাটিন
গ. ইংরেজি
ঘ. জার্মান

২. কোনটি শিখন নয়?
ক. বাবুই পাখির বাসা বানানো
খ. ডলফিনকে বল দিয়ে খেলানো
গ. সার্কাসে হাতির বল খেলা
ঘ. গনকের টিয়া পাখির খাম তোলা

৩. প্রতিটি শিশুই কোন নাকোন বুদ্ধিমত্তার অধিকারী- এটি কার অভিমত?
ক. ইভান প্যাভলভ
খ. বি এফ স্কিনার
গ. হাওয়ার্ড গার্ডনার
ঘ. সিগমাণ্ড ফ্রয়েড

উত্তরমালা: ১. ক, ২. ক, ৩. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মনোবিজ্ঞানকে আচরণের মনোবিজ্ঞান বলা হয় কেন?
১. বিমূর্ত বিষয়ের তুলনায় মূর্ত বিষয় শিশুর শিখনকে ফলপ্রসূ ও অনেক বেশি স্থায়ী করে- ব্যাখ্যা করুন।
২. শিক্ষা মনোবিজ্ঞান পাঠের প্রধান বিষয়বস্তুগুলো কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা মনোবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের একটি প্রায়োগিক শাখা– আলোচনা করুন।
২. শিক্ষার চারটি মূল উপাদানের কার্যকরী প্রয়োগে মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ- ৫.২: গবেষণায় শিক্ষা মনোবিজ্ঞান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলোর নাম বলতে পারবেন।
- প্রতিটি পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- গবেষণার পদ্ধতিগুলো তুলনা করতে পারবেন।
- গবেষণার ধরন অনুসারে পদ্ধতিগুলোনর প্রয়োগ চিহ্নিত করতে পারবেন।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র একাডেমিক ডিসিপ্লিন হিসেবে বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে এর একটি নিজস্ব গবেষণা পদ্ধতিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একই সাথে বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের বৈশিষ্ট্য বিরাজমান থাকায় অন্যান্য মানব বিদ্যার ন্যায় শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের গুণগত ও পরিমানগত দু'টি গবেষণা পদ্ধতিই সমানভাবে ব্যবহৃত হয়। এই কারণে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতির পরিধি এবং ভিন্নতা রয়েছে। নিম্নে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের প্রধান প্রধান পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করা হলো:

পরীক্ষণ পদ্ধতি

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান একটি গবেষণামূলক বিজ্ঞান হিসেবে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় ব্যাপকভাবে পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে। পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের কার্য-কারণ (Cause-Effect) সম্পর্ক যাচাই এবং যাচাই পদ্ধতিটি বারংবার করা সম্ভব। যেমন: কোন একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা উপকরণ (Teaching Aid) কতটা কার্যকরী বা শিখনের ফলাফলের সাথে কী ধরনের সম্পর্ক রয়েছে তা যাচাই করা। ধরা যাক, সমমেধা সম্পন্ন সপ্তম শ্রেণির দু'টি ক্লাসের মধ্যে একটি নতুন শিক্ষা উপকরণের ব্যবহারের সাথে শিক্ষার্থীর শিখনের সম্পর্ক আছে কিনা– তা যাচাই করতে চাই (চিত্র ১)। সপ্তম শ্রেণির একটি দল 'ক'-কে একজন শিক্ষক মাল্টিমিডিয়ার মতো একটি শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে পাঠদান করলেন।

সপ্তম শ্রেণি		সপ্তম শ্রেণি
দল 'ক'		দল 'খ'
শিক্ষক মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার করে পাঠদান করলেন		শিক্ষক গতানুগতিকভাবে পাঠদান করলেন

চিত্র ১: শিখনে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের কার্যকারিতা যাচাই।

একই শিক্ষক সমমানের আরেকটি দল ‘খ’-কে গতানুগতিকভাবে পাঠদান করলেন। এখানে দল ‘ক’ পরীক্ষণ দল (Experimental Group) ও দল ‘খ’ নিয়ন্ত্রিত দল (Control Group)। ছয় মাস পাঠদান শেষে মূল্যায়ন পরীক্ষার ফলাফল দুটিকে তুলনা করলেন। যদি মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠদান করা দল ‘ক’ ‘খ’-এর তুলনায় নম্বর বেশি পায় তবে ধারণা করা যেতে পারে যে, মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে শিক্ষার্থীদের শিখনে প্রভাব ফেলেছে। পরীক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল থেকে কার্য-কারণ সম্পর্কটি সরাসরি পরিসংখ্যানগতভাবে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু মানব আচরণের বৈচিত্র্যতা এবং জটিলতার কারণে কোন বৈশিষ্ট্যের ফলে কোন কার্য-কারণ হবে তা নির্ণয় করা সবসময় সম্ভব হয় না। পদার্থ কিংবা রসায়ন বিজ্ঞানের গবেষণায় বিভিন্ন শর্তাদি যেমন পরীক্ষাগারে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কিন্তু মানব আচরণ, ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিবেশের প্রভার নিয়ন্ত্রণ করা দুরূহ ব্যাপার। যেমন উপরোক্ত পরীক্ষায় সমমেধার দ্বারা দল ভাগ করলেও ছয় মাসের ব্যবধানে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত মনোভাব, মানসিক স্বাস্থ্য অথবা স্বাস্থ্য, পারিবারিক ঘটনা শিক্ষার্থীর ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে। সুতরাং একমাত্র মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তির ব্যবহারই শিক্ষার্থীর ভাল ফলাফলে প্রভাব ফেলেছে- এরূপ নিশ্চিত করে বলা যায় না।

কেস স্টাডি পদ্ধতি

পরীক্ষণ পদ্ধতি যেমন ব্যাপক অংশগ্রহণকারীর উপর প্রয়োগ করে ফলাফলকে সাধারণীকরণ করা হয় কেস স্টাডিতে অল্প কিছু সংখ্যক অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে বিষয়বস্তুটিকে গভীরভাবে দেখা হয়। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির নানা ঘটনাকে সন্নিবেশিত করে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করে গবেষণা প্রক্রিয়াটি চালানো হয়। অথবা গবেষণার বিষয়টি বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনে কিভাবে সংগঠিত হয়েছে, কেন সংগঠিত হয়েছে-সেগুলোর সাথে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে ঘটনাটি ব্যাখ্যা করা হয়। সাধারণতঃ যেসব ঘটনা পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে কেস স্টাডি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন: মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা প্রবণতা বা স্কুল পলায়ন গবেষণার জন্য হয়ত অনেক সংখ্যক শিক্ষার্থী পাওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীর তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করা সম্ভব। কেস স্টাডিতে গবেষণার তথ্য আহরণের জন্য অংশগ্রহণকারীর ব্যবহৃত ডায়েরি, ব্যক্তিগত ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও সংশ্লিট পারিপার্শ্বিক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কস স্টাডির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন ব্যক্তি বা ঘটনা সম্পর্কে গভীরভাবে জানা। যেহেতু কেস স্টাডি গবেষণাটি অল্প কিছু ব্যক্তি বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়, সেহেতু গবেষণালব্ধ ফলাফলটি সাধারণীকরণ বা সবার উপর প্রয়োগ করা যায় না।

বিকাশমূলক পদ্ধতি

শিশুর জ্ঞানীয়, আবেগিক, শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট বয়সের সাথে সাথে একটি ধারাবাহিকতায় বিকশিত হয়। শিশুর সঠিকভাবে শিক্ষা লাভের জন্য বিকাশের এই গতি পথকে জানা একান্ত প্রয়োজন। বিকাশমূলক পদ্ধতি শিশুর ধারাবাহিক বিকাশকে জন্ম পূর্ববর্তী সময় থেকে পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্যন্ত বিকাশের বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করে থাকে। তাই এই পদ্ধতি একটি সময় ও শ্রম সাপেক্ষ গবেষণা পদ্ধতি। তবে সাধারণতঃ গবেষকরা গবেষণার সুবিধার্থে শিশুর কোন নির্দিষ্ট বয়স ক্রম বা বয়স সীমা ধরে গবেষণাটি পরিচালনা করে থাকেন। যেমন: বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী জ্যাঁ পিঁয়াজে (Jean Piaget) তাঁর নিজের শিশু সন্তানের উপর গবেষণা পরিচালনা করে শিশুর জ্ঞানীয় বিকাশের তত্ত্ব প্রদান করেছেন। এই গবেষণাটি যেহেতু বেশ দীর্ঘ সময় ব্যাপী পরিচালনা করতে হয়, সেহেতু অনেক গবেষণার ক্ষেত্রে এটি একটি উপযুক্ত গবেষণা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না।

চিকিৎসামূলক পদ্ধতি

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব এবং তথ্যাদি ও গবেষণা পদ্ধতি চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান হতে আহরিত। এর একটি প্রধান কারণ হলো শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষার কার্যকারিতার সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। মানসিক দ্বন্দ্ব, দুশ্চিন্তা, বিষণ্নতা, মানসিক চাপ, অপরাধবোধ, হীনমন্যতা, আতঙ্ক, ভীতি, উৎকণ্ঠার মতো মানসিক অবস্থা শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক জীবন যাপনকে বাধাগ্রস্থ করে। এছাড়াও বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে শুরু করে তরুণ সমাজের মাদকাসক্তি শিক্ষার্থীকে সামাজিক, জ্ঞানীয়ভাবে নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে, এমনকি মৃত্যু ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান এসব বিষয় নিয়ে গবেষণার জন্য চিকিৎসামূলক পদ্ধতি বহুলভাবে ব্যবহার করে থাকে। সিগমান ফ্রয়েড (Sigmund Freud), কার্ল ইয়ুং (Carl Jung), আলফ্রেড এডলার (Alfred Adler) এই গবেষণা পদ্ধতির প্রধান পুরোধা। এই পদ্ধতিতে সিগমাণ্ড ফ্রয়েড-এর অবাধ অনুষঙ্গ (Free Association) কিংবা প্রতিফলন অভীক্ষার মাধ্যমে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির মানসিক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যেমনঃ অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে একটি উপযুক্ত পরিবেশে রেখে তার মনে বা চিন্তায় যে কথার উদ্রেক হয়, তা দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করতে বলা হয়। মনোচিকিৎসক এই কথাগুলোকে বিশ্লেষণ করে ব্যক্তির অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব থেকে যে মানসিক আচরণ বৈষম্য দেখা দিয়েছে, সেগুলো নির্ণয় করতে পারেন। চিকিৎসামূলক পদ্ধতির জন্য দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়। অনেক ক্ষেত্রেই গবেষক ভেদে এই বিশ্লেষণের ফলাফলে ভিন্নতা দেখা যায় যা এই গবেষণা পদ্ধতির এটি একটি সীমাবদ্ধতা।

পরিসংখ্যান পদ্ধতি

আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে পরিসংখ্যানগত তথ্য মনোবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের একটি প্রধান উৎস। বিভিন্ন গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যগুলোকে গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তির মানসিক সংগঠন, আচরণের সম্ভাব্যতা এবং কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ঘটনা সম্পর্কে মনোভাব পরিমাপ করা যায়। বর্তমানে নিত্য নতুন পরিসংখ্যান পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং কম্পিউটার সফ্টওয়ারের মাধ্যমে বিশাল পরিমাণ তথ্যকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে ব্যক্তির আচরণের নানা দিকগুলোর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। সাধারণতঃ কার্যকারণ বিশ্লেষণ, বিভিন্ন আচরণের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় অথবা আচরণের পূর্বানুমানের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তবে ব্যাপক পরিমাণ তথ্য থাকা শর্তেই কেবল এই পদ্ধতি কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়। অল্প সংখ্যক তথ্যের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণে এটি ভাল ফলাফল দেয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন গবেষণা পদ্ধতিতে পরীক্ষণ দল ও নিয়ন্ত্রিত দল থাকে?
ক. পরিসংখ্যান পদ্ধতি
খ. চিকিৎসামূলক পদ্ধতি
গ. পরীক্ষণ পদ্ধতি
ঘ. বিকাশমূলক পদ্ধতি

২. একজন শিক্ষার্থীর নিয়মিত শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধানে কোন পদ্ধতিটি সবচেয়ে উপযোগী?
ক. পরীক্ষণ পদ্ধতি
খ. কেস স্টাডি
গ. বিকাশমূলক পদ্ধতি
ঘ. চিকিৎসামূলক পদ্ধতি

৩. কোন গবেষণা পদ্ধতিটির জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়?
ক. চিকিৎসামূলক পদ্ধতি
খ. পরিসংখ্যান পদ্ধতি
গ. বিকাশমূলক পদ্ধতি
ঘ. কেস স্টাডি

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ, ৩. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন ধরনের গবেষণার জন্য চিকিৎসামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে?
১. অধিক তথ্য বিশ্লেষণের জন্য কোন পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়?
২. কোন একটি শিক্ষণ পদ্ধতির কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য কোন পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণিকক্ষে গতানুগতিক বক্তৃতা পদ্ধতির তুলনায় দলীয় আলোচনা শিক্ষার্থীদের শিখনে অধিক কার্যকরী ভূমিকা রাখে– শিখনের এই দু'টি পদ্ধতির কার্যকারিতা তুলনার জন্য গবেষক হিসেবে আপনি কোন গবেষণা পদ্ধতিটি ব্যবহার করবেন এবং কেন? আলোচনা করুন।
২. ইংরেজি বা বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ভীতি দূরীকরণে গবেষণার কোন পদ্ধতিটি ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত? ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ- ৫.৩: বিকাশে সামাজিক পটভূমি: পরিবার, সহপাঠী ও বিদ্যালয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিশুর বিকাশে পরিবারের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- শিশুর বিকাশ ও ইকোলজিক্যাল সিস্টেম থিওরির চারটি স্তর ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিশু প্রতিপালন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিশুর বিকাশে শিশু প্রতিপালনের গুরুত্ব বিবৃত করতে পারবেন।

পরিবার

শিশু বিকাশে পরিবার শিশুর সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানব শিশুর বিকাশ অনেক ধীর এবং স্বাবলম্বী হবার পূর্ব পর্যন্ত অনেক সময়ের জন্য শিখন ও সহায়তার প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর প্রায় সবকটি সমাজ ব্যবস্থায় পরিবার রয়েছে এবং পরিবারই শিশুর বিকাশের দায়িত্ব নিয়ে থাকে। পরিবার ও পরিবারের সদস্যরাই শিশুর সারাজীবনের সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। সমাজের একক হিসেবে পরিবারের মাধ্যমেই শিশু ভাষা, সামাজিক নিয়ম-কানুন, মূল্যবোধ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রথম পাঠটুকু অর্জন করে। একইভাবে পরিবারের মাধ্যমেই সামাজিক ও আবেগিক দ্বন্দ্ব যেমন হিংসা, বিদ্বেষ ও সম্পর্কের টানাপোড়েন ইত্যাদি শেখে। পরিবারই হচ্ছে সামাজিকীকরণের মূল মাধ্যম। আমেরিকার সাইকোলোজিস্ট ইউরি ব্রনফেনব্রেনার ইকোলজিক্যাল সিস্টেম থিওরি-তে দেখিয়েছেন যে, শিশু পরিবার, সমাজ এবং তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের একটি বহুমাত্রিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠে।

শিশুর বিকাশ ও ইকোলজিক্যাল সিস্টেম থিওরি

প্রতিটি শিশু কতগুলো জন্মগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এসব বৈশিষ্ট্য শিশুর ব্যক্তিত্ব, শিখন, আবেগ ও আচরণকে নির্দেশিত করে। সামাজিকভাবে বসবাস করার কারণে শিশুর এই বৈশিষ্ট্যের কারণে পরিবার, প্রতিবেশী, বৃহত্তর সমাজ, প্রথা, ঐতিহ্য, মিডিয়া এমনকি রাষ্ট্রীয় নীতি ও আইন-কানুন দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন একটি শিশু জিনগত বৈশিষ্ট্যের কারণে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী অথবা উচ্চতর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হতে পারে। পরিবারের মনোভাব এবং প্রচেষ্টা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে। রাষ্ট্রীয় প্রতিবন্ধী বান্ধব আইন বা রাষ্ট্রীয় ভাতা শিশুকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে পারে। একইভাবে পরিবারের নেতিবাচক মনোভাব বা রাষ্ট্রের উদাসীনতা শিশুটিকে অক্ষম এবং অর্থনৈতিকভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল করে তুলতে পারে। শিশুর বিকাশকে পরিপূর্ণভাবে বোঝার জন্য তাই শিশুর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তার পরিবার ও সে যে পরিবেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রে বসবাস করছে-সেটি সম্পর্কে জানা একান্ত প্রয়োজন। শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের এই মিথস্ক্রিয়া-ই হলো ইকোলজিক্যাল সিস্টেম থিওরির মূলকথা।

ব্রনফেনব্রেনার ইকোলজিক্যাল সিস্টেম থিওরিতে শিশুর পরিবেশকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করেছেন। প্রতিটি স্তর শিশুর বিকাশ ও শিখনে শক্তিশালী প্রভাব রাখে। নিম্নে ইকোলজিক্যাল সিস্টেম থিওরির প্রতিটি স্তর আলোচনা করা হলো–

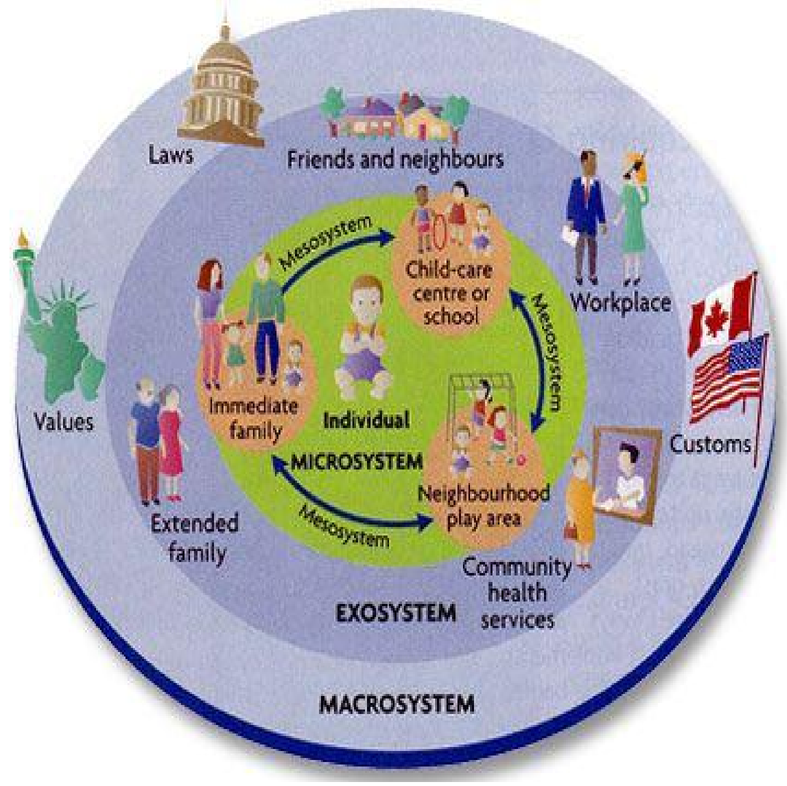

চিত্র ১: ইকোলজিক্যাল সিস্টেম থিওরির পাঁচটি স্তর (উৎস: ইন্টারনেট হতে সংগৃহীত)।

১. **মাইক্রোসিস্টেম:** ব্রনফেনব্রেনারের ইকোলজিক্যাল সিস্টেম থিওরির প্রথম স্তর হলো মাইক্রোসিস্টেম। শিশু ও তার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত পরিবারের বাবা-মা, শিশুর প্রতিবেশী, সহপাঠী, শিক্ষক যাদের সংস্পর্শে আসে তাদের নিয়ে এই মাইক্রোসিস্টেম গড়ে ওঠে। সরাসরি শিশুর সংস্পর্শে আসা এই সিস্টেমটিতে শিশু এবং পরিবারের অন্যান্য উপাদানগুলো ক্রমাগত একজন আরেকজনকে প্রভাবিত করে। যেমন শিশু যে ধরনের সহপাঠীদের সংস্পর্শে আসে তাদের ভাষা, চাল-চলন ও সৌজন্যবোধ শিশুর আচরণে প্রভাব ফেলে। তেমনিভাবে বিদ্যালয় ভেদে শিক্ষকগণের মধ্যে অভিজ্ঞতায়, শিক্ষাগত এবং পেশাগত যোগ্যতায় পার্থক্য বা ভিন্নতা থাকে। শিক্ষকদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও আচার-আচরণ শিশুদের শিখনে সরাসরি পার্থক্য নিয়ে আসে। একইভাবে শিশুর নিজের আচরণ, রেসপন্স শিশুর সংস্পর্শে আসা সহপাঠীকেও প্রভাবিত করে। একজন রাগান্বিত শিক্ষার্থীর সাথে বয়স্ক অভিভাবক কিংবা সহপাঠীর যে আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, একজন শান্ত শিক্ষার্থীর সাথে ভিন্ন আচরণ করবে।

২. **মেসোসিস্টেম:** ব্রনফেনব্রেনারের দ্বিতীয় স্তর হলো মেসোসিস্টেম। মাইক্রোসিস্টেমের উপাদানগুলোর পরস্পর সম্পর্ক এবং শিশুর উপর তার প্রভাব হচ্ছে মেসোসিস্টেম। শিশুর সাথে তার পরিবার, শিক্ষক, বিদ্যালয়ের সম্পর্ক শিশুর বিকাশকে যেমন প্রভাবিত করে তেমনি বিদ্যালয়, পরিবার, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী পরস্পরের সম্পর্ক শিশুর বিকাশ এবং শিখনে বড় ধরনের প্রভাব রাখে। ব্রনফেনব্রেনার মাইক্রোসিস্টেমের এই উপাদানগুলোর সম্পর্ক শিশুর বিকাশকে কিভাবে প্রভাবিত করে তা মেসোসিস্টেম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। শিশুর অভিভাবকের সাথে বিদ্যালয়ের এবং শিক্ষকের সুসম্পর্ক শিশুর মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। একইভাবে পরিবারের সাথে শিশুর সহপাঠী, খেলার সাথীদের পরিবারের সাথে পরিচয় ও যোগাযোগ থাকলে পরিবার যেমন জানে তার সন্তান কোথায় কি করছে, তেমনি শিশুকে যে কোন বিপদজনক আচরণ থেকে ঝুঁকিমুক্ত রাখা যায়।

৩. **এক্সোসিস্টেম:** যেসব সামাজিক উপাদান বা প্রতিষ্ঠান সরাসরি শিশুর দৈনন্দিন জীবনের সংস্পর্শে আসে না কিন্তু তাদের কার্যক্রম শিশুর জীবন ও শিখনে পরোক্ষভাবে প্রভাব রাখে– সেগুলোই এক্সোসিস্টেম। যেমন বিদ্যালয়ের স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি অথবা বাবা-মায়ের কর্মস্থলের সঙ্গে শিশুর সরাসরি যোগাযোগ থাকে না। কিন্তু বিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট কমিটি শিক্ষক নিয়োগ, ক্লাস রুটিন প্রণয়ন, পরীক্ষার সময়সূচি প্রণয়ন, ছুটি, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করে। আবার বাবা-মায়ের কর্মস্থলের পরিবেশ যেমন মাতৃত্বকালীন-পিতৃত্বকালীন ছুটি, ডে-কেয়ার ব্যবস্থা, শিশুর অসুস্থতাজনিত ছুটি, শিশুদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা শিশুর প্রতিপালন ও শিখনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাবা-মায়ের কর্মস্থলের বারবার পরিবর্তন, কম বেতন, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা শিশুর সামাজিক ও আবেগিক বিকাশকে ব্যাহত করতে পারে। একইভাবে জেলা শিক্ষা অফিস, স্থানীয় খেলাধূলার সংস্থা, স্থানীয় পৌরসভার শিশু বান্ধব সুযোগ-সুবিধা যেমন পার্ক, খেলাধূলার মাঠ, ব্যায়ামাগার এক্সোসিস্টেম হিসেবে শিশুর বিকাশে পরোক্ষভাবে প্রভাব রাখে।

৪. **ম্যাক্রোসিস্টেম:** ব্রনফেনব্রেনারের সবচেয়ে বাহিরের স্তরটি হলো ম্যাক্রোসিস্টেম। শিশু যে দেশে বসবাস করে সে দেশের আইন-কানুন, শিশু নীতি, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, সম্পদ ও অর্থনৈতিক অবস্থা শিশুর শিখন ও বিকাশের সাথে যে সম্পর্ক– সেটিই হলো ম্যাক্রোসিস্টেম। যেমন কোন দেশের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক কিনা বা কোন শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক এই আইন শিশুদেরকে বিনামূল্যে মৌলিক শিক্ষা অর্জনে সুযোগ করে দেয়। শিশু প্রতিপালনে সরকারি নীতি যেমন মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং জাতীয় টিকাদান কর্মসূচি শিশুর মাতৃদুগ্ধপানকে দীর্ঘায়িত করে এবং রোগ প্রতিরোধ ও সংক্রমণ থেকে শিশুকে রক্ষা করে। জাতীয় ভিটামিন এ খাওয়ানো কর্মসূচি, জাতীয় প্রতিবন্ধী আইন ও কল্যান নীতি, রাষ্ট্রীয় সম্পদের পর্যাপ্ততা অথবা সমবণ্টন ওই দেশেস্থ শিশুদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একটি সম্পদশালীদেশ ওই দেশের শিশুদের শিক্ষার জন্য যে ধরনের ব্যয় বহন করতে পারে; অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া দেশ শিশুর মৌলিক চাহিদা মেটাতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।

৫. **ক্রনোসিস্টেম:** ব্রনফেনব্রেনারের মতে আমাদের চারপাশের পরিবেশ ও তাদের মিথস্ক্রিয়া একটি স্থির বিষয়ে আবদ্ধ নয়। বরং চক্রম পরিবর্তনশীল। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ঐতিহ্য, আইন, সামাজিক ব্যবস্থা, ও সমাজের নানা উপাদান পরিবর্তীত হয়। যেমন এক সময় মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বেগম রোকেয়া অনেক সংগ্রাম করেছিলেন। আজকে প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অনেক এগিয়ে আছে। সময়ের এই পরিবর্তন এ প্রজন্মের মেয়েদের শিক্ষা ও বিকাশকে সাবলীল করেছে। এক সময় শিশুর শিক্ষায় শুধু মুখস্থ বিদ্যা প্রচলিত ছিল। আজকের শিশুরা মাল্টিমিডিয়া, ছবি, অঙ্কন, শিক্ষা সফর, ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্ব সম্পর্কে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল; তেমনি নানা ধরনের সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে।

আমরা দেখেছি শিশুর শিখনে সামাজিক ব্যবস্থা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এক্সোসিস্টেম এবং মেসোসিস্টেম শিশুর আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে এবং পরিবার শিশুর অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে শিশুর প্রাথমিক বিকাশের সময়কালে একটি প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। পরিবারে শিশু কিভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে তা শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। ডায়না বমরাইন্ড (Daina Baumrind) প্রি-স্কুলের অভিভাবক-শিশুর পরস্পরের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার উপর গবেষণা করেছিলেন। তাঁর গবেষণায় তিনি দেখিয়েছেন, শিশুর প্রতিপালনের ভিন্নতায় শিশুর আবেগিক ও সামাজিক বিকাশে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি চার ধরনের শিশু প্রতিপালনের ধরন দেখিয়েছেন, যথা–

১. গণতান্ত্রিক শিশু প্রতিপালন (Authoritative Child Rearing);
২. একতান্ত্রিক শিশু প্রতিপালন (Authoritarian Child Rearing);

৩. অনুমোদিত শিশু প্রতিপালন (Permissive Child Rearing);
৪. অবহেলিত শিশু প্রতিপালন (Uninvolved Child Rearing)।

১. গণতান্ত্রিক শিশু প্রতিপালন (Authoritative Child Rearing)

গণতান্ত্রিক শিশু প্রতিপালনটি সর্বোৎকৃষ্ট। এই প্রতিপালন পদ্ধতিতে শিশুরা বাবা-মায়ের কাছে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। বাবা-মা শিশুর প্রতিটি বিষয়ে অংশগ্রহণ করে থাকে। তারা শিশুর প্রতি উষ্ণ, মনোযোগী, ধৈর্যশীল এবং শিশুর প্রয়োজনের প্রতি যত্নশীল। তারা শিশুর সাথে একটি আনন্দদায়ক ও আবেগিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। শিশুর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য শিশুর কোন চাহিদাকে পূরণের ক্ষেত্রে বা কোন মতাদ্বন্ধে তারা শিশুর সাথে কথা বলেন এবং সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান করেন। শিশুর স্বাধীনতার ব্যাপারেও তারা খুব কঠোর বা খুব নমনীয় না হয়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেন। ফলশ্রুতিতে শিশু স্বাধীনভাবে কাজ করার ও স্বতস্ফূর্তভাবে চিন্তা করার সুযোগ পায়। শিশুরা পরিবারের মাধ্যমে সমঝোতা শেখার কারণে বিদ্যালয়ে সামাজিক সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে পারদর্শী হয়। বাবা-মা ও পরিবারের সাথে ভাল সম্পর্ক এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ থাকার কারণে তারা আত্ম-প্রত্যয়, পড়াশুনার প্রতি প্রেষণা উচ্চ মাত্রায় থাকে এবং পড়াশুনায় ভাল করতে দেখা যায়।

চিত্র ২: গণতান্ত্রিক শিশু প্রতিপালন।

২. একতান্ত্রিক শিশু প্রতিপালন (Authoritarian Child Rearing)

যেসব পরিবারে একতান্ত্রিক শিশু প্রতিপালন দেখা যায় তারা মূলত শিশুকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না এবং শিশুর যে কোন বিষয়ে কম অংশগ্রহণ করে থাকে। তারা মনে করেন, শিশুদের বোঝার ও সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা কম। শিশুরা সবসময় বড়দের কথা শুনবে এবং বড়দের কথা মতোই চলবে। শিশুর ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে সহজে মেনে নিতে চান না। এসব পরিবার সাধারণত শিশুদের কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে চান। এসব নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা শাস্তি ও তিরস্কার করে থাকেন। শিশুর প্রতি এরূপ একতান্ত্রিক আচরণ শিশুর মধ্যে হীনমন্যতার জন্ম দেয় এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এসব প্রতিপালন বৈশিষ্ট্যের কারণে শিশুর মধ্যে শিখন চর্চা ও বিদ্যালয়ে আচরণের মধ্যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সে কখনো অত্যন্ত অনুগত কখনোবা আগ্রাসী মনোভাব প্রদর্শন করে। নিয়ন্ত্রিত আচরণে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে বিদ্যালয়ে শিখনে অনেক সময় ভাল ফলাফল প্রদর্শন করলেও সৃজনশীল কাজে সে পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারে না।

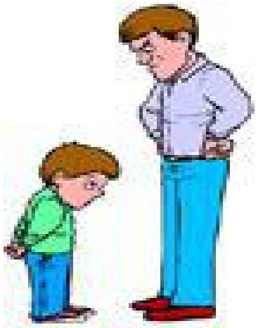

চিত্র ৩: একতান্ত্রিকশিশু প্রতিপালন।

৩. অনুমোদিত শিশু প্রতিপালন (Permissive Child Rearing)

কিছু কিছু শিশু প্রতিপালন চর্চায় অভিভাবকরা উষ্ণতা ও গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও শিশুর প্রতি তাদের হয় অতি অনুমোদন অথবা অমনযোগিতা থাকে। তারা হয় সব কাজকে অনুমোদন করেন অথবা শিশুর বিভিন্ন কার্যক্রমে উদাসীন থাকেন। শিশুর প্রতি এই উদাসীনতা অথবা অতিরিক্ত অনুমোদন দেয়ার কারণ হয় তারা মনে করেন তারা শিশুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না, নতুবা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বা সময় নেই। পরিবারে এ ধরনের অনিয়ন্ত্রণ চর্চার কারণে শিশু বিভিন্ন উদ্দীপকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফলশ্রুতিতে শিশুর আচরণে ও শিখনে নিয়ন্ত্রণহীনতা দেখা দিতে পারে। বিদ্যালয়ে শিশুর শিখনে নিম্নগামীতা বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ঝুঁকে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

চিত্র ৪: অনুমোদিতশিশু প্রতিপালন।

৪. অবহেলিত শিশু প্রতিপালন (Uninvolved Child Rearing)

যেসব পরিবারে শিশু সহজভাবে গৃহীত হয় না এবং অভিভাবক ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের শিশুর প্রতি সম্পৃক্ত হতে পারে না। এই পরিবার গুলো অবহেলিত শিশু প্রতিপালন হিসেবে চিহ্নিত হয়। এসব পরিবারে শিশুর অভিভাবক ব্যক্তিগত, মানসিকভাবে বিপর্যস্থ থাকার কারণে সে মানসিক ও আবেগিকভাবে শিশুর সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেন না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব অভিভাবক ব্যক্তিগত হতাশা, উৎকণ্ঠা, বিষণ্নতা কিংবা মাদকাসক্তির কারণে মানসিকভাবে ব্যতিব্যস্ত থাকেন। ফলশ্রুতিতে শিশু পরিবার থেকে শুধু স্নেহ-মায়া-মমতা, ভালবাসা বা উষ্ণতাই হারায় না, শিশু তার মানসিক পীড়নের সময় অভিভাবকদের কাছ থেকে মানসিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। পরিবারের অবহেলা জনিত কারণে মানসিক সাপোর্ট ছাড়াও শিশুর দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ হতে বঞ্চিত হয়। নিয়মিত অবহেলা শিশুর মধ্যে নিম্ন মাত্রার আবেগিক নিয়ন্ত্রণ, আত্ম-প্রত্যয়, আত্ম-বিশ্বাস তৈরি করে। এসব শিশুরা বিদ্যালয়ে একাডেমিক ফলাফলে দুর্বল হতে পারে এবং অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকিতে থাকে। ডায়না বমরাইন্ড মূলত চারটি শিশু প্রতিপালনের প্যাটার্নের কথা বলেছেন। শিশু প্রতিপালনে বিভিন্ন পরিবার এই চারটি অথবা এই চারটির সমন্বয়ে শিশু প্রতিপালন করে থাকে। তবে ধরনগুলো যেমনই হোক না কেন পরিবারে শিশুর প্রতি গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধীনতা শিশুর ব্যক্তিত্ব, সামাজিক এবং জ্ঞানীয় বিকাশে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। পারিবারিক ধরন শিশুকে বিদ্যালয়ে সফলভাবে খাপ খাওয়াতে এবং কাঙ্ক্ষিত একাডেমিক ফলাফল অর্জনে সহায়তা করে।

চিত্র ৫: অবহেলিত শিশু প্রতিপালন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সামাজিকীকরণের মূল মাধ্যম কোনটি?
ক. পরিবার
খ. বিদ্যালয়
গ. সহপাঠী
ঘ. খেলার সাথী

২. কোনটি একতান্ত্রিক শিশু প্রতিপালনের বৈশিষ্ট্য?
ক. শিশুর প্রতি অবহেলা
খ. শিশুর চাহিদাকে গুরুত্ব দেয়া
গ. অভিভাবকের চাহিদাকে গুরুত্ব দেয়া
ঘ. শিশুর সাথে সমঝোতা করা

৩. কোনটি মাইক্রোসিস্টেম-এর অন্তর্ভুক্ত নয়?
ক. পরিবার
খ. প্রতিবেশী
গ. সহপাঠী
ঘ. রাষ্ট্র

উত্তরমালাঃ ১. ক, ২. গ, ৩. ঘ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইকোলজিক্যাল সিস্টেম থিওরির মূলকথা কী?
২. গণতান্ত্রিক পরিবারের বড় হওয়া শিশুর বিদ্যালয়ে কী ধরনের আচরণ প্রতিফলিত হয়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্রনফেনব্রেনারের মেসো ও মেক্রোসিস্টেম কীভাবে একজন মাধ্যমিক শ্রেণির কিশোরীর বিকাশ ও শিখনে প্রভাব রাখতে পারে? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।
২. শিশু প্রতিপালনের পদ্ধতিগুলো শিশুর শিখনের উপর বিরূপ প্রভাব রাখে– উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।